Q:3' বলাকা' কাব্য রচনার প্রেক্ষাপট আলোচনা করে ১ সংখ্যক কবিতার কাব্যিক আবেদনটি আলোচনা কর।

য়ুরোপে সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ও উন্নত রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ফলশ্রুতিতে অনিবার্য ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা, তৃতীয় বিশ্বের কবি হিসাবে ১ম বিশ্বযুদ্ধকে তিনি যেভাবে দেখেছিলেন,'বলাকা'-র দর্পনে তা প্রতিবিম্বিত। 'বালাকা' পর্বে মোট ৭টি কবিতা শান্তিনিকেতনে লেখা। কলকাতায় লেখা ৪টি। রামগড়ে ৩টি। এলাহাবাদে ৪টি, সুরুলে ৭টি, শিলাইদহ পদ্মায় লেখা ১৭ টি আর শ্রীনগরে লেখা ২টি। ১টি লেখা সুরুল থেকে কলকাতায় ফেরার পথে ট্রেনে। ১ম ৪টি কবিতা বাদ দিলে বাকি ৪১ টি কবিতা ১ ম বিশ্বযুদ্ধের উন্মত্ত প্রহরে লেখা। আশ্চর্যজনক হলেও, ১ম ৪ টি কবিতার অনুসঙ্গে যুদ্ধের অনুরণন ছিল, অথচ তখন ও যুদ্ধের প্রহর শুরুই হয়নি।'বলাকার'প্রেক্ষাপটে যেমন ১ম বিশ্বযুদ্ধের অনুসঙ্গ, তেমনি কবিতা গুলোর ভাষা নির্মাণ, প্রকাশের ক্ষেত্রে আছে 'সবুজ পত্রের' প্রণোদনা। বলাকার ৪৫ টি কবিতার ২৬ টি প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্রে', বাকিগুলো প্রকাশিত হয় - 'প্রবাসী' 'ভারতী' 'মানসীতে'। যৌবনের জয়গান, মহাবিশ্বের চিরস্থির চির -চঞ্চলের মধ্যে অবিরাম গতিবেগের অনুভূতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হিংস্রতা ও মানবতার লাঞ্ছনা, প্রেম ও মৃত্যু ভাবনা, সৌন্দর্য দর্শন ও ঈশ্বর চেতনা- 'বলা কার কবিতা এইযে নানান রূপ, নানান মেজাজ দার্শনিক বীক্ষার বৈচিত্র্য, তার মূলে আছে 'সবুজপত্রে'র তাগিদ।

বিশ্বভারতীর সাহিত্য ক্লাসে 'বলাকা'পড়াতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন-('বলাকার কবিতা গুলি রচনার সময়) আমার প্রানের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙ্গাচোরা আয়োজন চলছিল।.... এই কবিতাগুলি ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা আসছিল। হয়তো এদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এই জন্যই একে 'বলাকা' বলা হয়েছে। হংস শ্রেণীর মতনই তারা মানসলোক থেকে যাত্রা করে একটি অনির্বাচনীয় ব্যাকুলতা নিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে'। তাই বলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য- 'গতিবাদ' রবীন্দ্রনাথের 'গীতালি'প্রকাশের পূর্বেই ফরাসি দার্শনিক বার্গসঁ রং বিখ্যাত গ্রন্থ 'Creative Evolution' ('ক্রিয়েটিভ ইভোলুশন') প্রকাশিত হয়।'বলাকার'গতি অনুভবের পেছনে অনেকেই বার্গসঁর 'এলান ভাইটাল' তত্ত্বের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তবে 'বলাকা'র গতিবাদ অনেকটাই বার্গসঁর নিরর্থক গতিবাদের সম্ হলেও সম্পূর্ণ এক নয়। বার্গসঁর গতিবাদ সম্পূর্ণ নিরর্থক, তাতে কোন পরিণাম বা সার্থকতার স্থান নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলাকায় উদ্দাম বেগে নিরর্থক বেয়ে চলার কথা বললেও কয়েক জায়গায় পরিনামের প্রসঙ্গও রয়েছে। প্রমথ নাথ বিশীর মতে বলাকার গতিবাদ - "অবিরাম গতি অবিচলিত গ্রামের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া সার্থকতা লাভ করিল"।গতিবাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য 'বলাকা'য় হৃদয়বেদ্য রসানুভূতিতে পরিণত হল। দর্ষণের গতিবাদ হলো কাব্যের গতি রাগ।

'বলাকা'কাব্যে মানবমুখিনতা নতুনতর অনন্য। এই মানবমুখিনতার 'মানব'রবীন্দ্র কবিমানসে নতুনতর, পূর্বের রবীন্দ্রনাথের মানবেরা কেবল ভারতবাসী ছিল, এখানে রবীন্দ্রনাথের মানবেরা বিশ্ববাসী। কাব্যটি প্রকাশিত হয় -১৩২৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে, ইং ১৯১৬ সালে। মোট ৪৫টি কবিতার মধ্যে ১ ম ৩৪টি ১৩২১ বঙ্গাব্দে, শেষের ১১ টি ১৩২২ কার্তিক থেকে পরের বৈশাখের মধ্যে লিখিত। আলোচ্য কাব্যের ভাব ধৃত পংক্তিগুলো সীমার বন্ধন ছিন্ন করে সব রকমের স্থিরতাকে আঘাত করে গতির আনন্দে কখনো দীর্ঘ ধারায় প্রবাহিত, কখনো সংযুক্ত চরন থেকে সরে গিয়ে স্বাধীন, কোথাও বেগের আবেগে পরবর্তী চরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছন্দ হিল্লোল সৃষ্টি করেছে। কোন কোন চরণ মুক্তির আনন্দে নিজে কেটে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত, আবার একটি বিশেষ আবেগে একটিমাত্র শব্দে একটি নতুন চরণের সৃষ্টি। এরকম অসম মাত্রিক ছন্দই বলাকা কাব্যের বৈশিষ্ট্য। এই মুক্ত স্বভাবকে অনেকে বলেন "মুক্তক ছন্দ "বা "মুক্ত বন্ধ" ছন্দ। আবার কেউ কেউ এ ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ছন্দেরই রবীন্দ্রনাথ কৃত অভিনব রূপে বলে মনে করেন যা অন্ত্যানুপ্রাস যুক্ত। পাশ্চাত্য সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত ছন্দকে Free Verse বা Verse- Libre বলে।এ কাব্যের ভাষা তীক্ষ্ণ, দীপ্ত, শানিত ও উজ্জ্বল। এ কাব্যের ছন্দের গতি ময়তা ও ভাষার সংহতি এবং নবতর বক্তব্যকে

রূপ দেওয়ার কারণে এর আঙ্গিক একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে। এর আঙ্গিকের ১ টি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ করে তোলা। বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক গতি চেতনা বিশেষ করে উপনিষদীয় গতি চেতনা এবং তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর শোশিত নিপীড়িত মানবের পক্ষাবলম্বনকারী মানবিক চেতনার সম্মিলনে গ্রন্থটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে।

'বলাকা'র ১ সংখ্যক কবিতাটি রচিত একান্তই সবুজপত্রের জন্য, সবুজপত্রের ১ ম সংখ্যার জন্য। আর সবুজপত্র যেরকম বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ভাব ও ভাষা এনেছে,'সবুজের অভিযান' ও তেমনি। কবিতাটিতে কবি দুরন্ত নবীনদের ক্রমশ অশান্ত প্রচন্ড, প্রমও প্রমুক্ত হয়ে অমর হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। তাদেরকে পুরনো, বদ্ধ সংস্কার আচ্ছন্ন জীবনধারাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে নতুন জীবন ধারা, নতুন মূল্যবোধ নতুন মূল্যায়নে বলিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াবার আহ্বান জানাচ্ছেন। একই সাথে মনে করিয়ে দিচ্ছেন পথের বাধা বিঘ্নের কথাও। আর এই বাধাবিঘ্নগুলো অতিক্রম করে নতুন কে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই নবিনের এই অমরতা লাভ সম্ভব।

পরবর্তীতে কবি যখন কবিতাটির ব্যাখ্যা করেন, তিনি মূলত যৌবন ও প্রবীণতার দ্বন্দ্বে বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রবীণতা বাধা বিঘ্ন এড়িয়ে আপ্ত বাক্য- শাস্ত্র বাক্য বাঁধা বুলি মেনে নিরাপদ জীবন যাপন করতে চায়। অন্যদিকে যৌবনের ধর্মই হলো নিয়ম না মানা, বিপদ মাথা পেতে নিয়ে সবকিছুকে প্রত্যক্ষ করা, অনুভব করা। বাখ্যা র শেষে উপসংহার টেনে তিনি বললেন- 'যৌবন ই বিশ্বের ধর্ম, জরাটা মিথ্যা। যৌবন জোরা সন্ধের দুর্গ ভেঙে ফেলে জীবনের জয়ধ্বজা উড়ায়।

এই নতুন কে বরণ করাতেই মানব ও মানব আত্মার মুক্তি আর তা কালে কালে পুনরাবৃত্ত হয়। বহু সংগ্রামে লব্ধ নতুন ও একসময় পুরনো হয়ে যায়। তাতে আবাস গড়ে জীর্ণতা বদ্ধ প্রথা, শেকড় প্রোথিত করে নানা সংস্কার। তখন সেই লব্ধ নতুন টিকেও বদলানোর প্রয়োজন পড়ে। আর তরুণেরা যখন সেই বদলানোর কাজে প্রবৃত্ত হয় তখনই প্রবীণেরা, যারা একসময় বহু সংগ্রামে সেই নতুন কে লাভ করেছিল, তারা প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে কারণ তাদের অধিকাংশই তখন প্রবীণ। আরেকবার বদলানোর সাহস তাদের আর নেই তারাই তখন অতীত মুখো হয়ে ওঠে, অতীতের প্রসঙ্গ তুলে তর্ক করে, কিন্তু তাতে কান দেয়া নবীনের কর্ম নয়, নবীনরা তখন সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে পুচ্ছ উচ্চে তুলে নাচায়।

এই আপাত সমসাময়িকতাহীন কিন্তু সার্বজনীন আবেদনে অসাধারণ কবিতাটিই সাময়িক আবেদনে ভাস্বর হয়ে ওঠে, যখন 'বলাকায়' অন্তর্ভুক্ত হয়। তার সাময়িক আবেদনে আবিষ্কৃত হয়- কবিতাটিতে এক সাময়িক সংকট রয়েছে। কবিতাটি রচিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই, তখনও বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়নি ঠিকই, কিন্তু একটা ভাঙ্গাচোরার আয়োজন দানা বেঁধে উঠেছে। আর সেই দানা বেঁধে উঠতে থাকা অসন্তোষ, ভাঙাচোরার আয়োজন কবি ইংল্যান্ডে আমেরিকায় গিয়ে প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। তাই ভারতবাসীরা এখনো সেভাবে সচেতন হয়ে না উঠলেও কবি ভীষনই সচেতন, তিনি যেন ভারতবাসী নবীনদের সচেতন করে দিচ্ছেন-"বাহির পানে তাকায় না যে কেউ/দেখে না যে বান ডেকেছে/জোয়ার জলে উঠেছে প্রবল ঢেউ"।তবে এই নতুনের লক্ষ্য যে আসলে কী, এই পরিবর্তন মানুষকে কোনদিকে নিয়ে যাবে, কবি এখনো তা জানতে পারেননি, তা জানা খুব সহজ ও নয়। তবু কবি এই নতুনকেই বক্ষে তুলে নিতে চান, নতুন কে বরণ করতে আপদ আঘাত বিনা দ্বিধায় মাথায় তুলে নিতে চান, আপদ আঘাত উজিয়ে এগোতে চান নতুনের পথে, অজানার পথে, অনির্দিষ্টের পথে-"আন রে টেনে বাঁধা পথের শেষ/বিবাগী কর আবাধ পানে/পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে"।

পরিবর্তনের উদ্দেশ্য খুঁজে না পেলেও, কবি এই কবিতাতেই আশা করেছেন, নতুনের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে,'বার্গসঁ মত কবি নিরন্তর গতিশীল থেকে নিরন্তর পরিবর্তনের কথা বলছেন না। তিনি পরিবর্তনের শেষে একটি নতুন প্রাপ্তিতে বিরামের আশা করেছেন, আর তাই শেষ স্তবকে এসে তার কবিতায় নবীন নিজের গলায় বকুলের মালা পরিয়ে দেয় বসন্তের গলায়।

'বসন্তেরে পরাস আকুল করা
আপন বলার বকুল মাল্য গাছা'।

এই বসন্ত নতুনের প্রতীক, বসন্ত এলে যেমন প্রকৃতিতে নতুনের মেলা বসে যায়, গাছগুলো নতুন পাতা আর নতুন কুঁড়িতে সেজে ওঠে, তাই দেখে পাখিরা দরাজ গলায় আনন্দের গান গাইতে শুরু করে দেয়, নবীনদের সবুজ দের অভিযান শেষেও তেমনি মানবসমাজে বসন্ত আসবে, মানুষ নতুন সমাজ বাস্তবতায় নতুন মূল্যবোধে নতুন করে বাঁচতে শিখবে, জীবনের নতুন মানে খুঁজে বার করে জীবন যাপন করবে। আর যে নবীনরা এই নবযুগ আনল, তাদের জন্য প্রশংসা -গীত গীত হবে। এক্ষেত্রে আরেক কথা স্মর্তব্য রবীন্দ্র কাব্যে প্রকৃতি মানুষের বিকল্প,'রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে মানব সত্তাকে জানিইয়াছেন, প্রকৃতি প্রীতির মধ্যে তিনি মানব প্রীতির স্বাদ পাইয়াছেন। আর তাই এই বসন্ত যে বিজয়ী নতুন মানব সমাজের আকাঙ্ক্ষাজাত বা রূপক বসন্ত নয়, তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল।